বাংলা নাটকের ইতিহাস : ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও কিছু প্রশ্ন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটার অধীনে

পি. এইচ. ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

(সারসংক্ষেপ)

গবেষক

তূর্ণা দাশ

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ তৃণা নিলীনা ব্যানার্জী

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কালচারাল স্টাডিজ

সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, ক্যালকাটা

কলকাতা-৭০০ ০৯৪

২০২১

অধ্যায় ভাবনা

ভূমিকা	বাংলা নাটকের ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত ও কিছু প্রশ্ন
অধ্যায় এক	অভিনেত্রীর বিশুদ্ধিকরণঃ উনিশ শতকীয় “সভ্য” থিয়েটারে অভিনেত্রীর অনুপ্রবেশ
অধ্যায় দুই	নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনঃ একটি বিকল্প পাঠ
অধ্যায় তিন	বাংলা ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবাদ
অধ্যায় চার	বাংলা নাটকের মঞ্চসজ্জাঃ বিকল্প ইতিহাস রচনার সম্ভাবনা
সিদ্ধান্ত	একটি বিকল্প পদ্ধতির সন্ধান

ভূমিকাঃ

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার মূল প্রতিবন্ধকতা হল, এই ইতিহাসের একটি প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় সুপরিচিত আখ্যান বা ন্যারেটিভ আছে। দীর্ঘকাল ধরে সেই নির্দিষ্ট বর্ণনাগুলিই প্রচলিত, প্রচারিত ও চর্চিত হয়ে এসেছে। নতুন গবেষণার বেশিরভাগ কাজ এই Existing History-কে মান্যতা দিয়েই শুরু হয়। কিন্তু আজকের ইতিহাস চিন্তকরা এই প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে ভেঙ্গেচুরে দেখার প্রয়াস করতে চাইছেন। প্রথাগত ইতিহাস সাধারণত কতগুলি প্রচলিত ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সেই ধারণাগুলোকে আমরা স্বতঃসিদ্ধ বা যেকোনো প্রশ্নের উর্দ্ধে বলে ধরে নিই। সেই প্রচলিত ধারণাগুলিকেই আজ প্রশ্ন করতে চাইছেন আধুনিক ইতিহাসবিদরা। অর্থাৎ ইতিহাস রচনার যে ভিত্তি বা foundation, তার স্বরূপ উদ্ঘাটনেই বেশি মনোযোগ দাবী করেছেন তাঁরা। এই সূত্রে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা দীপেশ চক্রবর্তীর মতো বুদ্ধিজীবীরা প্রথাগত ইতিহাসকে নিয়ে অনেক গভীর সমালোচনা ও বিতর্ক করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই পথ ধরেই আমার এই গবেষণার প্রয়াস।

এত বছর ধরে তৈরি হওয়া নাট্য ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে বিশ্লেষণাত্মক মননটি প্রায়শই অনুপস্থিত হয়ে পড়ে। অতীত কর্মকাণ্ডের গরিমা-বর্ণনাই বাংলা নাট্য ইতিহাসের মূল ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায়। কিছু ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সেই প্রয়াসগুলি রয়ে গেছে ব্যতিক্রমী নিরীক্ষা হিসেবেই। মূল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসে তাই বাদ পড়েছে অনেক বিষয় অথবা অতিকথন ও অতিরঞ্জকতায় অনেক সময়েই সত্য থেকে খানিক সরে এসেছে ইতিহাস, এমনটা মনে করার কারণ আছে বলেই মনে হয়।এইখানেই বর্তমান গবেষকের ভূমিকা। সমগ্র জাতির একটা অখণ্ড ইতিহাস আছে, এটা কল্পনা করে নিলে সমাজের অনেক ঘটনা, উপকরণ ও সম্ভাবনাকে উপেক্ষিত হতে হয় বলে মনে হয়। ইতিহাসের এই 'সমগ্রতা'-র ভাবটিকে তাই প্রশ্ন করার যথেষ্ট কারণ এসে পড়ে। এই কারণে প্রচলিত একটি 'সামগ্রিক' ইতিহাসের ভেতরে চোখ রাখাটাই আমার উদ্দেশ্য। নতুন কোনো বর্ণনাত্মক ইতিহাস রচনা নয়; প্রতিষ্ঠিত Dominant ইতিহাসে যে যে বিষয়গুলি স্থান পেয়েছে, সেগুলির স্বরূপের দিকে নজর করা, আবার যে যে বিষয়গুলি এই ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি, সেগুলির অনুপস্থিতির কারণগুলিকেও লক্ষ্য করা আমার কাজ।

যদিও সমগ্র নাট্য ইতিহাস নিয়ে এই স্বল্প পরিসরে কাজ করা সম্ভব নয়। তাই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের নির্দিষ্ট কতগুলি টুকরো টুকরো বিভাগকে ধরে আমার গবেষণা এগিয়েছে। এই গবেষণা করতে গিয়ে নাট্য প্রযোজনা বিষয়ক কোনো নতুন ঐতিহাসিক হদিশ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বরং, যাকে আমরা সর্বজনস্বীকৃত বাংলা নাট্য ইতিহাস বলে গ্রহণ করে নিয়েছি, তার মধ্যে কী কী ফাঁক দেখা যাচ্ছে অথবা আর্কাইভ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সামগ্রী থেকে কোন কোন বিশ্লেষণ দেখা যাচ্ছে এবং কোন কোন বিষয়ে নাট্য ইতিহাস সতর্ক নিশ্চুপ থেকেছে-এই বিষয়গুলোই বর্তমান গবেষক নির্দেশ করার চেষ্টা করেছে।

গবেষণা পদ্ধতিঃ

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের আকরগ্রন্থগুলিতেযে বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে, যে ঘটনা নিয়ে প্রচুর লেখালেখি-তর্ক-বিতর্ক-প্রচার—আলোচনা হয়েছে, সেই রকম কয়েকটি বিষয় নিয়ে এই গবেষণার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে কাজ করা হয়েছে। পাশাপাশি, একটি এমন বিষয় চতুর্থ অধ্যায়ে আনা হয়েছে, যে বিষয়ে বাংলা নাট্য ইতিহাস একেবারে নিঃশ্চুপ থাকতে চেয়েছে বা বলা ভাল, একেবারেই গুরুত্ব দিতে চায়নি। অর্থাৎ অতি-আলোচিত এবং একেবারেই অনালোচিত—এই দুই ধরনের বিষয়কে নিয়ে একই গবেষণা পদ্ধতিতে একটা প্রতিতুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণাটি করার জন্য আমি পূর্ববর্তী বেশ কিছু প্রাজ্ঞ সমাজতাত্ত্বিক ইতিহাসবিদদের রচনাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করেছি। বাংলা থিয়েটারের সামগ্রিক ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থ, বেশ কিছু মৌলিক নাটক ও গ্রন্থ, নানান আত্মজীবনী বা জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি, মধুসূদন দত্তের নাট্য কর্মকাণ্ডের সময়কালীন বেশ কিছু চিঠিপত্র, উনিশ শতকীয় অসংখ্য সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বা সমালোচনাগুলি ইত্যাদি আমার গবেষণায় বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। এরপরের বিশাল অংশ জুড়ে আছে, আমার গবেষণার তাত্ত্বিক ক্ষেত্রটি। সেই কাজে বেশ কিছু বই বা প্রবন্ধ বা গবেষণা নিবন্ধ আমার গবেষণাটির তাত্ত্বিক পরিসরটির ভিত্তি মজবুত করেছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের দেশ-জাতি-গণতন্ত্র প্রসঙ্গে আলোচনা, সুমন্ত ব্যানার্জীর উনিশ শতকীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস নিয়ে বিকল্পধারার বিশ্লেষণ, বিশ শতকের গোড়ার দিকে সমাজে মেয়েদের অবস্থান নিয়ে রিমলি ভট্টাচার্যের রচনাগুলির ওপর আমি বিশেষ নির্ভর করেছি। এছাড়াও সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের ইতিহাসের অগ্রগতি কীভাবে হয়েছে, সে ব্যাপারে তপতী গুহ ঠাকুরতার গভীর তাত্ত্বিক অনুসন্ধান আমার গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

বর্তমান গবেষণার প্রাসঙ্গিকতাঃ

আমার গবেষণাটি প্রথাগত সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাস কাঠামোটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করার সুযোগ নিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস-জ্ঞানকে এই গবেষণা কয়েকটি লেন্সের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করেছে মাত্র। কিন্তু গবেষণার শেষে যে প্রশ্নগুলো উঠে এসেছে, সেই প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর হিসেবে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছতে চাইনি বা পারিনি। বরং এটি প্রশ্ন করার একটি সচেতন পদ্ধতি হয়ে ওঠার আশা রেখেছে। আদি–মধ্য-অন্ত বিশিষ্ট কোনো ইতিহাস আখ্যান নয়, ইতিহাসকে টুকরো টুকরো ঘটনা হিসেবে বিচার করে মহান আখ্যান বা Grand Narrative-এর মধ্যেকার ফাঁকগুলোকে নির্দেশ করাই আমার উদ্দেশ্য থেকেছে। সবক্ষেত্রে যে আমি এই নির্মোহ অবস্থান বজায় রাখতে পেরেছি, এমন কথা অবশ্যজোর দিয়ে বলা কঠিন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্লেষণ ভঙ্গি যে আমার চেতনাকেও কিছু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য, সে সত্যও আমার চেতনায় বহমান থেকেছে।

গবেষণা প্রশ্ন:

নাট্য-ইতিহাস সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিকে নির্দিষ্ট কতগুলি বিভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। সেই ভাগগুলির নিরিখেই ধাপে ধাপে গবেষণা-প্রশ্নগুলিকে রূপায়িত করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণার প্রধান প্রশ্নগুলি হলঃ

- বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রীদের জাতি-ধর্ম-বর্গ ভেদে অবস্থানটি কীরকম ছিল? উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলার Performance History-তে যেভাবে মেয়েদের বহুল উপস্থিতি দেখা যায়, ক্রমে তা খানিকটা বাধার সম্মুখীন হতে শুরু করল কেন? এই সূত্রে উচ্চবর্গীয় সমাজে 'ভদ্রমহিলা' গড়ে তোলার উদ্যোগটি কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকতে পারে?
- বাংলা নাট্যজগতের প্রতিবাদী নাট্যের ঐতিহাসিক প্রবহমানতা ঠিক কেমন ছিল? ব্রিটিশের অনাচারের প্রতিবাদে উনিশ শতকের শেষের দিকে যে যে প্রতিবাদী নাট্যক্রিয়াগুলি নিয়েটি ঠিক কীরকম? এই সময়ের ঘটনাবলী কি একটা ব্যতিক্রমী প্রতিবাদী স্ফুলিঙ্গের মতোই হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্ত? নাকি এই ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী সময়ের প্রতিবাদী নাট্যধারার ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে? সময়টিকে নিয়ে প্রচলিত ইতিহাসের রাজনৈতিক আলোচনাও কতটা জোরালোভাবে করা হয়েছে, সেই প্রশ্নটিও জরুরী।
- উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে যে নতুন ধারার স্বদেশী নাট্য আন্দোলন শুরু হয়, তার সঙ্গে সেই সময়ের হিন্দু-জাতীয়তাবাদী ভাবনার কতটা সামঞ্জস্য ছিল? স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় বীরের ভাবনা, মুসলমান জাতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্ক বা ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে ভারতীয়দের যে বিরোধিতা বা বোঝাপড়ার যে অনুষঙ্গ গড়ে উঠছিল, সেই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নাট্য জগতের প্রবণতাগুলি কেমন ছিল?
- বাংলা নাট্য ইতিহাসে মূল ধারার বিবরণীতে মঞ্চসজ্জার ইতিহাসের স্থান নেই কেন? শুধুমাত্র তথ্যের অভাবে কি প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস থেকে মুছে গেছিল এই ইতিহাস? নাকি এই বিবরণীতে আসলে নিম্নবর্গের মানুষদের একটা প্রধান ভূমিকা এসে পড়েছিল, সেই প্রশ্ন এসেই যায়। উচ্চবর্গীয় ঐতিহাসিক অ্যাখ্যানে কেন বাদ পড়ে গেল মঞ্চ নাটকের কারিগরি দিকটি?

অধ্যায় ভাবনাঃ

প্রথম অধ্যায়ঃ

প্রথম অধ্যায়ে প্রশ্ন-বিভাগটি হল ইতিহাস রচনা ও তার সঙ্গে লিঙ্গের সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে। প্রশ্ন আসে, নারীর বাংলা থিয়েটারে অভিনেত্রী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে এত বাদানুবাদ কেন? আমি দেখাতে চেয়েছি, অষ্টাদশ শতকের বাংলায় কীর্তন দল, ঝুমুর নাচ, বাউল গান, ভাদু উৎসব, টুসু গান, কথকতা, পাঁচালি গান—এরকম অসংখ্য লোক পরিবেশনায় নিম্নবর্গের মেয়েদের উল্লেখজনক উপস্থিতি ছিল। মহিলাদের দ্বারা পরিবেশিত লোককলাগুলির মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল-ছড়াগান, কবিতা, প্রবাদ, গান, নাটকীয় রচনা - এবং তাঁদের বিভিন্ন উপধারা বা কীর্তন, পাঁচালী, কবি গান, তরজ, ঝুমুর

গান, বিভিন্ন নৃত্য, যাত্রা অনুষ্ঠান, কথকতা, আবৃত্তি, বিয়েতে বাসর গান এবং কিছু মহিলাদের আচার -অনুষ্ঠানের গান ইত্যাদি।

যদিও এই ধরনের রচনার বেশিভাগেরই লেখকের নাম জানা যায় না, মৌখিক ঐতিহ্য বা ওরাল ট্রাডিশনের মধ্যে দিয়ে এগুলো বাহিত হয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু টেক্সট থেকে কয়েকজন নারী সুরকারের জীবন কাহিনী এবং তাঁদের নামগুলি সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এমনকি পুরুষ লোকশিল্পী ও রচনাকারদের লেখা থেকেও তাঁদের মহিলা সহকর্মীদের সম্পর্কে আন্দাজ করা সম্ভব হয়েছে। এর থেকেই ধরা যায়, রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমের গানগুলিতে বিশেষ করে নারী গায়করা অত্যন্ত সংযুক্ত ছিলেন। এই মেয়েরা উনিশ শতকের বাংলার গ্রাম এবং কলকাতার বাজার এবং রাস্তায় ভিড় করে গান-নাচ-অভিনয় করতেন। এই মহিলা গায়কেরা ছিলেন বৈষ্ণব, এঁরা বোষ্টমী বা নেড়ি নামে পরিচিত ছিলেন।

নেড়িকবিরা তাদের নিজস্ব গানের দল নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন এবং রাধা এবং কৃষ্ণ, শিব ও পার্বতী এবং কালীর উপর গান গাইতেন। এই নেড়িকবিরা বাংলার সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছিল। পুরুষ কবিয়ালদের লেখা একটি চিঠি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়। তারা সেই চিঠিতে অভিযোগ করেছিল যে কীভাবে কিছু বছর আগে "নেড়ি বৈষ্ণবীরা" তাদের প্রায় সব উৎসবের সময় গান এবং নাচের মাধ্যমে তাদের পেশা থেকে বিতাড়িত করে ফেলেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপে তারা আবার নেড়িদের উৎখাত করে নিজেদের কবিয়ালের পেশাটিকে বাঁচিয়ে তুলতে পেরেছে।

আরও একটি উদাহরণ এই সূত্রে উল্লেখ্য। উনিশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতায় ভোলা মাইরা, নীলু ঠাকুর এবং অন্যান্য বিখ্যাত পুরুষ কবিদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যজ্ঞেশ্বরী নামে পরিচিত একজন মহিলা কবি। এই নারী কবি অনেক সময়েই তার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কবিগানের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে ছিলেন। অথচ এই যজ্ঞেশ্বরীও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষ কবিদের কাছ থেকে অপমান এড়াতে পারেননি। যজ্ঞেশ্বরীর গানের উত্তরের বিখ্যাত ভোলা ময়রা; বাবুদের উপস্থিতিতে তাঁকে অসম্মানিত করার জন্য তাকে "নির্লজ্জ" মহিলা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।

বৈষ্ণব ঠাকুরাণিরা আগে উচ্চবিত্ত মহলের মেয়েদের গৃহশিক্ষিকার কাজ করতেন। ভদ্রমহিলা গড়ে তোলার উদ্যোগ থেকে এই বৈষ্ণবীরা একে একে কাজ হারাতে লাগলেন। অন্দরমহল থেকে বিতাড়িত হয়ে, বৈষ্ণব গায়িকারা কলকাতার রাস্তায়, এবং মাঝে মাঝে কিছু ধনী বাঙালি বাড়ির আঙ্গিনায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রিত হতেন প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তাঁরা ঢাপ নামের একটি বিশেষ ধরনের লঘু ছন্দের কীর্তনে পারদর্শী ছিলেন। সহচরী নামের এক মহিলা ঢাপশিল্পীর নাম পাওয়া যায়, যিনি ১৮৪০-এর দশকে একজন জনপ্রিয় কীর্তন গায়িকা ছিলেন। সহচরীর পরের এক বিখ্যাত ঢাপশিল্পী ছিলেন জগন্মোহিনী। এই জগন্মোহিনী লোকশিল্পের জগতে এক স্বতন্ত্র স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন বলে জানা যায়।

এইরকম ভাবে মেয়েরা লোকশিল্পে ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকার ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের থিয়েটারে মহিলা-অভিনেত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে এত জল্পনা হয়েছিল কেন? উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় ভিক্টোরিয়ান

নৈতিকতার চাপ পড়তে শুরু করছিল ইংল্যাণ্ডে। সেই চাপেরই প্রভাব এসে পড়ছিল তার ঔপনিবেশিক শহরগুলোতে। আর তারই প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী ভাবে যাদের সাধারণ নিম্নবিত্ত নারী বলে মনে করা হত, তারা সকলেই এক এবং একটামাত্র নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিতে চিহ্নিত হতে লাগল। আধুনিক শাসনচিন্তার একটা রূপ এই উনিশ শতক থেকেই প্রথম দেখা যাচ্ছে। আর এই ভিক্টোরিয়ান নীতিগত অবস্থানের প্রভাবেই "পরিবার" ধারণার বাইরে যে যে মহিলারা সমাজে বিচরণ করছিলেন, তাঁদের সবাইকেই একটি নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিতে ফেলে দেওয়া হল। এই ক্যাটেগরির মেয়েরা 'পরিবার'-এর শাসনতন্ত্রে বন্দী নন, আর তাই তাঁরা 'পরিবার' ধারণাটার প্রতি একটা আতঙ্ক ডেকে আনার ক্ষমতা রাখেন, আর তাই তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, এভাবেই মনে করা হচ্ছিল এই মেয়েদের সম্পর্কে। ফলে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সরকারের একটা অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়ালো এই জনগোষ্ঠীর মেয়েদের সমাজ বহির্ভূত করা, তাঁদের ঘৃণ্য হিসেবে প্রান্তিক করে তোলা।

নাট্যক্ষেত্রে বারবনীতা অভিনেত্রীদের প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রেক্ষিতে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য। প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে, দিল্লি ভিত্তিক মোগল সম্রাটরা, খুব কমই গ্রামীণ সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ এবং সামাজিক ভাবে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করতেন। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজস্ব এবং শুল্ক আদায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের কাছে এই মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রচলনগুলি রীতিমতো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো এবং প্রায়শই এগুলিকে অপরাধ হিসেবে দেখা হত। ব্রিটিশদের ‘কর্তৃত্ব’-এর ধারণাটি, মোগল প্রশাসনকে প্রতিস্থাপিত করে অধিকার কায়েম করেছিল এবং তাদের শাসনের ধরনটি ছিল অনেক বেশি সেন্ট্রালাইজড বা কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত। ব্রিটিশ প্রশাসনের এক অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের নৈতিক ভাবে সভ্য করে তোলা এবং তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধগুলির শুদ্ধিকরণ করা।

এই সংঘর্ষের সময় একদিকে ছিল প্রাক-ঔপনিবেশিক মূল্যবোধ ও সামাজিক প্রচলনগুলি, এবং অন্যদিকে ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের কর্তৃত্বের ধারণাটির প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া চালু করার উদ্যোগ, আর সঙ্গে চলছিল, সমসাময়িক ব্রিটিশ নৈতিক ধারণাগুলোর অনুকরণে ভারতীয়দের সামাজিক অভ্যাসগুলির সংস্কারের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। এই তিন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় টানাপোড়েনের মাঝে বাংলায় পতিতাবৃত্তি প্রথার সংজ্ঞাটি একটি পুনর্গঠন ঘটলো। এর আগে পতিতাবৃত্তিকে মনে করা হত ‘পাপ’, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন এই বৃত্তিকে চিহ্নিত করলো ‘অপরাধ’ হিসেবে।

এই সামাজিকভাবে ধর্মীয়ভাবে নির্ধারিত গ্রামীণ কাঠামোর মধ্যে, বারবনিতাকে 'পাপী' হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও, তাকে 'অপরাধী' হিসেবে ধরা হত না, এবং তার পেশাটাকে বহাল রাখার এক রকমের অনুমোদন সমাজে প্রচলিত ছিল।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে, পতিতাবৃত্তি ক্রমশ একটি 'অপরাধ' হয়ে ওঠে । উনিশ শতকের কলকাতা এবং তার শহরতলিতে যেভাবে পেশা সম্পর্কে ঔপনিবেশিক ধ্যানধারণাগুলো প্রবিষ্ট হচ্ছিল, সেই পথ অনুসরণ করেই এই পেশাটিকে এভাবে ‘অপরাধ’ হিসেবে চিহ্নিত করাটা শুরু হয়। একইভাবে 'পাপ'-এর সম্বন্ধে দেশীয় যে ধারণাগুলি প্রচারিত ছিল তার সঙ্গে ঔপনিবেশিক ধারণাগুলোর সংঘর্ষ বাঁধতে থাকে।

ঔপনিবেশিক সরকারের চোখে বেশ্যালয়গুলি আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে একপ্রকার যেন প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। উনিশ শতকের কলকাতার বেশ্যাপল্লিগুলির সঙ্গে অপরাধ জগতের গভীর সংযোগ লক্ষ্য করা যেতে শুরু করে। গ্রাম ও শহরতলীর বিরাট জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এই বেশ্যাপল্লি এলাকাগুলোতে জড়ো হতে শুরু করে। এই নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর মানুষদের যে পেশাগুলো উদ্ভূত হতে শুরু করে, সেগুলোকেই ব্রিটিশ সরকার "অপরাধ" হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকে। গোটা উনিশ শতকের বিভিন্ন সময় জুড়ে এই 'অপরাধ'-এর সংজ্ঞা নির্ধারিত হতে শুরু করে ও তার নিরিখে একে একে আইন প্রবর্তিত হতে থাকে। আর ব্রিটিশ নৈতিকতা বোধের প্রেক্ষিতে এই সময়েই "অশ্লীল অভিনয়" ও "শ্লীলতাহীন গান" একে একে সংজ্ঞায়িত হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে বারবণিতা অভিনেত্রীদের বাংলা নাট্যমঞ্চে পদার্পণের ঘটনাটিকে শুধুমাত্র 'মেয়ে'জাতির একটি সংগ্রাম হিসেবে দেখলে চলবে না। বেশ্যাবৃত্তিকে "পাপ" হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার একটি প্রবাহ হিসেবে বারবণিতা-অভিনেত্রীদের খতিয়ে দেখাটা বিশেষ জরুরি।

আমি বলতে চাইছি, নাট্যক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইটা হয়তো সমগ্র মেয়ে জাতির নয়। সূক্ষ্ম বিচার করে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, লড়াইটা আসলে 'বারবণিতা' জাতির। তাঁদের জীবনে 'বাড়তি পেশা' হিসেবে বাবুদের থিয়েটারপাড়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই এটা। অথচ প্রতিষ্ঠিত বাংলা নাট্য ইতিহাসে এই বারবণিতা-মেয়েদের নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লড়াইকে সমগ্র নারীসমাজের লড়াই হিসেবে বর্ণিত করা হয়েছে। নিম্নশ্রেণির একটি মেয়ে উচ্চশ্রেণির শিল্পমাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে, সমস্যা এটাই। নিম্নবর্গের মেয়েদের সংগ্রামকে গোটা নারী সমাজের ছবি হিসেবে প্রতিফলিত করা হয়েছে। সন্তর্পণে ঢেকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে তাঁর শ্রেণিগত ও জাতিগত অবস্থান। যে জাতিবর্গীয় পরিচয় থেকে তাঁর নাট্য শিল্পের জগতে পা রাখা, সেই সামাজিক প্রেক্ষিতটিকে যথাসম্ভব আড়াল করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় Dominant History Writing–এ।

সমসাময়িক নানান রচনা ও পরবর্তী যুগের সমস্ত লেখাতেই এই প্রবণতা দেখা গেছে। সমস্ত বর্ণনা বা বিশ্লেষণেই অভিনেত্রীদের নিয়মানুবর্তিতা, কাজের প্রতি মনোযোগ, শেখার ইচ্ছে ও শৈল্পিক প্রতিভার দিকে বেশি নজর দেওয়ার একটি উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগ অভিনেত্রীরা নিজেদের মূল পেশার পাশাপাশি থিয়েটারকেও একটি সমান্তরাল পেশা হিসেবে রাখতে চেয়েছিলেন। থিয়েটারে আসার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য তাঁদের সেটাই ছিল। তাঁদের নিজেদের লেখাপত্রেও এই বিষয়টি তাঁরা কোনোভাবে লুকোবার চেষ্টাও করেননি। অবশ্য অভিনেত্রীরা নিজেরাও তাঁদের বেশ্যা জীবনের কুৎসিত পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ খুঁজতেন। নিজেদের আত্মজীবনী রচনাতেও তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষার কথাটি যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়। সমাজের অবহেলিত অবাঞ্ছিত গোষ্ঠীর বেড়াজাল থেকে পালিয়ে তাঁরা উন্নততর সমাজে সম্মানিত হওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠিত নাট্য ইতিহাসকারদের নিজেদের শ্রেণিগত অবস্থান ও মূল্যবোধ থেকে তাঁরা অভিনেত্রীর জীবনকে লিপিবদ্ধ করতে থাকলেন। পেটের তাগিদের মতো কোনো 'নিকৃষ্ট' কারণে নয়, যেন শুধুমাত্র যেন 'মহত্তর' শৈল্পিক

উদ্দেশ্যেই বেশ্যাদের থিয়েটারে বিচরণ—এমনটাই প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেন ইতিহাসকাররা। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে মনে হয়, মেয়েদের মঞ্চে আসার ন্যারেটিভটি শুধুমাত্র তাদের আদর্শ শিল্পীজীবনের প্রতি মহৎ আকর্ষণের ফলাফল। আমার গবেষণার এই অধ্যায়ে মেয়েদের মঞ্চে আসা নিয়ে ইতিহাসকাররা যে নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে তাঁদের নিজস্ব শ্রেণী ও বর্গগত অবস্থানটি কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, আমি সেটাই নির্দেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

এর পরের প্রশ্ন-বিভাগটি বাংলা নাটকের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলা নাট্যমঞ্চে বেশ কিছু সমাজসচেতন প্রতিবাদী নাটকের অভিনয় হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেই নাটকগুলি বেশ স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ ইংরেজবিদ্বেষী বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন। ফলাফলস্বরূপ ইংরেজ সরকার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু করেন। নাট্যজগতের অত্যন্ত দেশপ্রেমী নির্ভীক অকুতোভয় ইমেজটিকে গড়ে তুলতে এই সময়টি নিয়ে নানান আকরগ্রন্থে একটি নির্দিষ্ট ন্যারেটিভ প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, নাট্য ইতিহাসের এই পর্বটিতে মূল নাট্যজগতের কর্মীদের কি আন্তরিক অংশগ্রহণ ছিল? নাট্য জগতের এই সাহসী অধ্যায়টি কি সত্যিই ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে নাট্যকর্মীদের সমবেত উদ্যোগ ছিল? নাকি সেখানে অন্যান্য অনেক জটিল অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল; সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার জন্য এই বিভাগের প্রশ্নগুলি পরিকল্পিত।

এই অধ্যায়ে আমি লক্ষ্য করেছি, এই সময়ের যাবতীয় ঘটনার প্রধান কাণ্ডারী হলেন, উপেন্দ্রনাথ দাস নামক এক উদ্যমী যুবা। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করলেন উপেন ও তাঁর সঙ্গীরা। অতীতের কাহিনীর ছায়ায় সমকালীন শাসকের সমালোচনা নয়; তাঁরা ইংরেজদের প্রকাশ্য সমালোচনা করে একেবারে সম্মুখসমরে আহ্বান জানালেন। তাঁর সমাজের তাঁর শ্রেণির অধিকাংশ মানুষ যেখানে আইনের সুশাসনের কামনায় অপেক্ষমান, উপেন সেই সময় নাট্যসংলাপের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ বিচারব্যবস্থাকে বক্রোক্তি করেছেন, বিচারালয় নিয়ে তাঁর নিজের রাজনৈতিক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।উপেনের ব্যক্তিজীবনের আলোচনা করে অনুমান করা যায়, সমাজসংস্কারক উপেন নাটক করতে এসেছিলেন জনসংযোগ ও রাজনৈতিক গণচেতনা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে, নাট্য আন্দোলনের আবেগ থেকে নয়। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক। সেই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি নাট্যমঞ্চের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। ইংরেজদের বিরূদ্ধে প্রতিবাদ করতে ও সমাজের বিভিন্ন প্রগতিশীল কার্যকলাপে বারবার উৎসাহী হয়েছেন উপেন। উপেন্দ্রনাথ নাটককে তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন বলেই মনে হয়।

এই অধ্যায়ে আমি বলতে চেয়েছি, বাংলা থিয়েটারের এই পর্বে যে মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি ঘটেছিল, তা একান্তভাবেই একটি সীমিত সময়ের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এই ঘটনার পরবর্তী সময়ের নাট্যধারার সঙ্গে এই সময়ের রাজনীতির তেমন কোনো সুদৃঢ় সম্পর্ক নেই বললেই চলে। শুধু শিল্পের আঙ্গিনায়

নয়, থিয়েটারের আবেদনটি ছিল রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক এবং তার বিরুদ্ধে যে যে রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলি সবক'টিই বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক পদক্ষেপ বলেই মনে হয়।

সেই কারণে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করা দরকার। তার মানে এ কথা বলা হচ্ছে না যে, এই ঘটনা বাদ দিয়ে বাংলা থিয়েটার জগতে যা যা নাট্যপ্রযোজনা হয়েছে, তাদের কোনো রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নেই। শুধু নাটক নয়, যেকোনো পার্ফর্মেন্স-এর ইতিহাসেরই কোনো না কোনো রাজনৈতিক ভিত্তি অবশ্যই থাকেই। কিন্তু আলোচ্য ঘটনার রাজনৈতিক চরিত্রের সঙ্গে সেইসব পরোক্ষ রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে একই আধারে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা, সে ব্যাপারে প্রশ্ন আসে।

কিন্তু আমাদের প্রচলিত নাট্য ইতিহাসের নানান অরাজনৈতিক নির্বিষ ঘটনাবলীর মাঝে এই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে এই রকমের একটি বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়টিকে সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন বলে মনে হয়। উপেন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক সক্রিয়তার সঙ্গে সাধারণ নাট্যশিল্পীদের মনন ও গতিবিধিকে মিলিয়ে ফেললে সত্যের অপলাপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই ঘটনার মূল্যায়ন করার সঠিক ক্ষেত্র হল রাজনৈতিক অঙ্গন। উপেন্দ্রনাথের এই রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে আপামর নাট্য জগতের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে মিশিয়ে বর্ণনা করে বিপ্লবী থিয়েটারের একটা প্রবহমানতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষণসময়ের এই ব্যতিক্রমী প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ঘটনার ইতিহাস ব্যাখ্যায় যে ভ্রান্তি বা অতিকথন ঢুকে পড়েছে, তা ইতিহাসের ফাঁক তৈরি করে ফেলেছে বলে আমি মনে করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

পরবর্তী প্রশ্ন-বিভাগটি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও নাট্যমঞ্চে তার প্রভাবটি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক রাজনীতিতে কতটা মিশে ছিল হিন্দু পৌরোহিত্য এবং তার প্রভাব বাংলা নাট্যরচনায় কেমনভাবে এসেছে, সে আলোচনা আনা হয়েছে।

অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ ও সেই সময়কার 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদ'-এর ভাবনাটির বিকাশ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ থেকে হিন্দু জাগরণ ও হিন্দু নির্মাণের যে কার্যাবলী শুরু হয় এবং জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেম, স্বাদেশিকতার ভাবনায় যেভাবে এই 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদ'-এর ধারণাগুলি প্রবিষ্ট হতে থাকে, সেই বিষয়গুলি নিয়ে এই অংশে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই সূত্রে 'নতুন হিন্দু' গড়ে তোলার উদ্যোগের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নেশন' ও ধর্ম সংক্রান্ত স্বতন্ত্র ভাবনাগুলিকেও উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের লেখায় আদর্শ জাতি ব্যবস্থা ও হিন্দু সমাজের আইডিয়ায় সর্বধর্মের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য বিধানের কথা বলা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের এই ধর্ম আলোচনা ও সমাজনীতি আলোচনার বিশ্লেষণ করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বলছেন, রবীন্দ্রনাথের বিচারে আদর্শ হিন্দু সমাজ সাভরকর বা স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণিত হিন্দুত্বের সমগোত্রীয় নয়। "...হিন্দুত্ব তাঁর কাছে হিন্দুসমাজের "আইডিয়া" বা "মানসরূপ", কোনো আচার বা ধর্মমতের লক্ষণ দিয়ে তার ব্যাপ্তি বিচার করা যাবে

না"। আবার বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের জাতীয়তাবাদী চেতনায় আসলে ধর্ম একটি মূল বুনিয়াদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে মনে হয়। ফলে জাতীয়তাবাদ ও ধর্ম একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে এক বিশিষ্ট রূপে প্রচারিত হয়েছিল বলে আমার ধারণা।

অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে, বিশ শতকীয়সমাজ-রাজনীতি-ধর্মচিন্তার নিরিখে নাট্যজগতের কর্মসূচীগুলিকে নিরীক্ষণ করা হয়েছে। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে নাট্য-অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন লাগু হওয়ার পর থেকেই বাংলা নাটক ধর্মীয় ও পৌরাণিক নাট্যপ্রযোজনা করে গেছে পরবর্তী কয়েক দশক ধরে। এই সময়ের নাট্যগতি বিশ্লেষণ করে অনুমান করা যায়, আপাত 'রাজনীতিহীনতা'র রাজনীতিকে বেছে নিয়েছিল বাংলার থিয়েটার জগত। অসংখ্য ধর্মীয় পৌরাণিক নাটকের ভক্তিরসে গা ভাসিয়ে চলতে থাকল নাট্যস্রোত।

আর তারপরেই বিপুল সংখ্যায় নাট্য জোগানের স্বার্থে ক্রমশ মৌলিক নাটকের পাশাপাশি সাহিত্য থেকে নাট্যরূপান্তরের পরিকল্পনা নেওয়া শুরু হয়। এই সময়ের কিছু আগে থেকেই বাংলা রঙ্গমঞ্চে একটার পর একটা গল্প বা উপন্যাস থেকে নাট্যরূপ দিয়ে সেই নাট্যরূপের মঞ্চায়নের রীতি প্রচলিত হয়। এই সূত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাসের নাট্যরূপান্তরগুলি। বঙ্কিমের একটার পর একটা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ বংলা রঙ্গমঞ্চের এক নতুন জোয়ার এনেছিল। কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ্য। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমের 'রজনী' ও 'সীতারাম' উপন্যাস দুইটি মঞ্চস্থ হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটারে এবং ১৮৯৭-তে সেখানেই প্রযোজিত হচ্ছে দেবী চৌধুরাণি। ১৮৯৯-এ ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রযোজনা করছেন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ভ্রমর'। অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল নাটকটি।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলোর সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চস্থ হতে থাকে রমেশচন্দ্র দত্তের বিখ্যাত কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপও। ১৮৭৯ সালের সময় থেকে ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হতে থাকল 'বঙ্গ বিজেতা', 'মাধবী কংকন'-এর মতো উপন্যাসাশ্রয়ী নাটকগুলো। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৮-এ নাট্যরূপ দেন রমেশচন্দ্রের 'জীবন সন্ধ্যা'। এর পাশাপাশি অমৃতলাল বসু নতুন ধরনের কিছু উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া শুরু করলেন। থিয়েটারকে বাঁচানোর জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা রমেশচন্দ্র দত্তের মতো রোমান্টিক বা ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে বাদ দিয়ে সাধারণ সামাজিক বিষয় কেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন। এর জন্য তিনি তারকনাথ গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসটিকে বেছে নেন। উপন্যাসের নায়িকার নামে সেই নাটকটির নাম দেওয়া হয় 'সরলা'। স্টার থিয়েটার থেকে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় এবং ভীষণ রকম জনপ্রিয়তা পায় এই নাটকটি।

কিছু বছর পরেই বাংলা মঞ্চে জায়গা করে নিচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বউ ঠাকুরানির হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে 'রাজা বসন্তরায়' নাটক ১৮৮৬-তে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অথবা চোখের বালি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিচ্ছেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ থিয়েটারের প্রথম যুগেই বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য হয়ে উঠছে বাংলা নাটমঞ্চের এক অন্যতম মূল সহায়। বিশ শতকের প্রথম অর্ধে সাহিত্য থেকে নাট্যরূপ দিয়ে প্রযোজনা করার রীতিটি আরও

জনপ্রিয় হতে দেখা হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা রঙ্গমঞ্চে জায়গা করে নিচ্ছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে 'বিরাজ বৌ'। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাস থেকে নাট্যরূপান্তর হচ্ছে 'রমা' নামে, 'দেনাপাওনা' মঞ্চস্থ হচ্ছে 'ষোড়শী' নামে।

মৌলিক নাটক, অনুবাদ নাটক, সাহিত্যনির্ভর নাটকের পাশাপাশি বিশ শতকের গোড়া থেকে শুরু হল ঐতিহাসিক নাটকের জয়যাত্রা। সেই ঐতিহাসিক নাটকগুলি উপেন্দ্রনাথ দাসের করা প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নাটক অনুসারী নয়। বরং এগুলিকে সেই সময়কার যুগের উপযোগী সামাজিক চাহিদার যোগান হিসেবে দেখাই বাঞ্ছনীয়। কোথাও সরাসরি ইংরেজ সমালোচনা না করে, মুসলমান শাসকের সমালোচনার আড়ালে সমসাময়িক রাজনীতিকে প্রতিফলিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল নাটকগুলি। নতুন ভাবধারায় স্ফুরিত দেশবাসীর আধুনিক জাতীয় বীরের রূপটি কেমন হবে, তার কর্মধারা কেমন হবে, তার শরীর মনের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিৎ, তাই নিয়ে গোটা হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় ভাবনা শুরু করেছিল সেই সময়ে। এই দেশীয় জাতীয় বীর ছিলেন হিন্দু শৌর্যের প্রতীক এবং তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো দস্যু বা হামলাকারী খলনায়কটি হয়ে উঠল মুসলমান অত্যাচারী কোনো রাজা। সমাজের চাহিদাকে অনুসরণ করে সেই আদর্শ জাতীয় বীরের সন্ধানে একটার পর একটা হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদী নাটক প্রযোজিত করতে থাকল বাংলা নাট্যসমাজ। যদিও কিছু মুসলমান বীরকে নিয়েও নাটক লেখা হয়েছিল। যেমন- মীর কাশিম বা সিরাজদ্দৌল্লা। সেখানেও কিন্তু সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে মুসলমান সমাজকে যে কূটনৈতিক কারণে আহ্বান করতে হয়েছিল, সেই পথ অনুসরণ করেই বাংলার নাট্যসমাজে মুসলমান বীরকে স্থান দেওয়া হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। অহিন্দু ভারতবাসীর এই দেশে অবস্থানটি ঠিক কী রকম হওয়া উচিৎ তাই নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের জায়গা তৈরি হচ্ছিল সেই সময়ে। অহিন্দুরা ব্যক্তিগত স্তরে স্বাধীন ধর্মাচরণ করতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যে হিন্দু সংস্কৃতিকে তাঁদের সম্মান করাই কর্তব্য। কারণ এই ভারতভূমি আসলে হিন্দুদেরই মাতৃভূমি। আর মুসলমানরা এ দেশের "পালিত সন্তান"। জাতীয়তাবাদের একেবারে শুরুর দিকের একটি গ্রন্থ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৮৭৬) থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় উদ্ধৃতি দিচ্ছেন, "ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয়দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ...মুসলমানেরাও ইহার পালিত সন্তান"। সেই "পালিত সন্তান"-এর মন পেতে রাজনীতি ক্ষেত্রের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলা নাট্যমহলে মুসলমান বীরকে স্থান দেওয়াও একটি স্বাদেশিক কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

সরাসরি ইংরেজ বিরোধিতা না করা সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করল কিছু নাটক। কিন্তু আগেরবারের নাট্য নিয়ন্ত্রণ ও এইবারের নাট্য নিষেধাজ্ঞার একটি বড় পার্থক্য দেখা গেল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় শাসকবিরোধী নাটক বন্ধ করতে ইংরেজ সরকার নাট্যকর্মীদের গ্রেপ্তার করেছে, দীর্ঘদিন মামলা চলেছে, আইন লাগু করেছে। ঘটনার গভীরতা এতই প্রবল ছিল যে তার পর থেকে প্রায় দুই দশক বাংলা রাজনৈতিক নাটক সাহস করে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি, ধর্মীয় নাটক মঞ্চস্থ করেই বাংলা নাট্যজগত আত্মরক্ষা করেছে। কিন্তু এইবারের বিদ্রোহী নাটক বা নাট্যকার বা

নাট্যব্যবস্থাপক কেউই ইংরেজ সরকারের কাছে তেমন বিপজ্জনক হয়ে উঠল না। তাদের নিয়ে সরকারের তেমন কোনো উৎকণ্ঠা ছিল না বলেই মনে হয়।

অনুমান করা যায়, আগেরবার ইংরেজদের তৎপরতার একটা অন্যতম কারণ ছিল এই যে, বাংলা নাটকে কিছু রাজনৈতিক কর্মী ও তার সহযোদ্ধা কিছু নাট্যকর্মীরা একত্রিত হয়ে সরাসরি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তোলে; কোনো ঐতিহাসিক কাহিনির প্রেক্ষিতকে ব্যবহার করে তাদের নাট্যবস্তু সংঘঠিত হয়নি। তাই হয়তো সেই নাটকের আবেদন ছিল জোরালো। কিন্তু উনিশ শতকের শেষভাগের ঐতিহাসিক নাটক যতই ইতিহাসের আড়াল নিয়ে রাজনৈতিক হয়ে উঠুক না কেন, ইংরেজ সরকারের কাছে সম্ভবত তেমন ভয়ংকর হয়ে ওঠেনি, বা উঠতে চায়নি। এমনকি ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্য শাসনের ষাট বছর পূর্তিতে অভিনীত হচ্ছে "হীরক জুবিলী" নাটক, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে অভিনীত হচ্ছে "শোকসঙ্গীত", স্বর্গারোহন", "অশ্রুধারা" নাটক। আবার কিছুকাল পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে দেখা যাচ্ছে, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে "রাণা প্রতাপ", ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে "মেবারপতন"-এর মতো স্বদেশী চেতনায় উদ্বুদ্ধ নাটক।

এই সূত্রে ভারতীয় রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণের ঘটনাটি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় মধ্যবিত্তের শিক্ষা, আইন, রুচি ইত্যাদির প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। ফলে ইংরেজদের রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি বা আইনব্যবস্থা কোনটাই আর তাদের কাছে 'বিজাতীয়' বা 'জটিল' মনে হয় না। তারা এই ব্যবস্থার অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে। আর এই ঔপনিবেশিক শাসনের একটা অন্যতম ফলাফল হিসেবেই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির 'জাতীয়তাবাদী' চেতনার উন্মেষ হয়। দেশীয় সংস্কৃতিকে দূষিত না করে ইংরেজদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার উদ্দেশ্য ছিল এই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মহলের। সর্বশক্তিময় ইংরেজ সরকারের অবস্থান থাকবে সবার ওপরে আর তার অধীনে অবনত ভারতীয়রা ছোট ছোট অসংখ্য গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে সরকারের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায়ের কাজ করবে। মোটামুটি এমনটাই ছিল গোড়ার দিকের জাতীয়তাবাদীদের পরিকল্পনা।

এই কারণে একে একে অনেকগুলি ভারতীয় সংগঠন গঠিত হয় এবং এই সংগঠনগুলির কার্যধারাকে মোটামুটি অপরিবর্তিত রেখে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম কুড়ি বছরটি ছিল নরমপন্থী পর্ব। প্রতি বছর তিনদিনের জন্য কংগ্রেস মিলিত হত। ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক কর্মপদ্ধতি নিয়ে মূলত সংস্কারমূলক আলোচনা করা হত এই অধিবেশনে। এর একটা অন্যতম কারণ হল, কংগ্রেসের সদস্যরা সকলেই ইংরেজদের সম্পর্কে তখনও অনেক দ্বিধায় ছিল। সরকারের কিছু কিছু নীতি বা কর্মধারা সম্পর্কে তারা মাঝে মাঝে প্রশ্ন তুলত ঠিকই, কিন্তু সাধারণভাবে ব্রিটিশের অপরাজেয় ক্ষমতাকে স্বীকার করেই তাদের রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিকল্পিত হত। যদিও কংগ্রেসের সর্বস্তরের সদস্যদের মধ্যেই যে ব্রিটিশদের প্রতি একইরকম অনুগত অবস্থান ছিল তা নয়। বিশেষ করে বিশ

শতকের শুরুর দিক থেকে ক্রমেই কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে, উভয়স্তর থেকেই ধীরে ধীরে চরমপন্থী বিশেষত্বগুলো জোরালো হতে থাকে।

কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারের এই বোঝাপড়ার সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে উনিশ শতকের একেবারে শেষের লগ্নে। ১৮৯৯ খ্রিস্টব্দে কলকাতা পৌরসভায় পরিবর্তনে আনায় নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা কমে যায়। এরপর ১৯০৪ খ্রিস্টব্দে বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন হয়, যাতে স্কুল-কলেজের অনুমোদন ও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব দেওয়া হয় সরকারি আমলাদের, হ্রাস হয় ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব। এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয় জাতীয়তাবাদী ভারতীয় শক্তিকে সংঘটিত করেছিল। সেটি হল বঙ্গভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তটি জাতীয়তাবাদীদের কাছে জাতীয় অবমাননা হিসেবে দেখা দিল আর নরমপন্থী আন্দোলনের ক্ষুদ্র ফললাভের কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে লাগল চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা। ক্রমে ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট, রাখীবন্ধন উৎসব, অরন্ধন ইত্যাদি পদ্ধতিতে জাতীয় আন্দোলন তার চরম রূপ নিতে থাকল।

জাতীয়তাবাদীদের এই রাজনৈতিক নীতি বদলের প্রেক্ষিতে নাট্য আন্দোলনের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে। কংগ্রেসের নরমপন্থী সময়েরও পূর্বে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রত্যক্ষ চরম ব্রিটিশ-বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস বলে মনে হয়। বঙ্গভঙ্গের সময়ে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের যে রাজনৈতিক তীব্রতা দেখা গেছিল, অনেকটা সেই ধারারই পূর্বসূরী ছিলেন উপেন, এমনটা বলাই যায়। সেই অর্থে দেখতে গেলে উপেন বস্তুত যুগের দাবীর অনেক আগেই তার রাজনৈতিক পদক্ষেপ পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। প্রায় তিন দশক পরে ভারতীয়রা যে দাবী ও স্বাভিমান নিয়ে ব্রিটিশের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখিয়েছিল, উপেন সেই প্রতিবাদী চেতনা নিয়েই তাঁর নাট্য ও রাজনৈতিক কর্মের উদ্যোগ নিয়ে ফেলেছিলেন বলে মনে করাই যায়।

অথচ উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে ঐতিহাসিক কাহিনী আড়ালে লেখা বিপ্লবী নাটকগুলি বোধহয় কেবল অনুসরণকারী হতে চেয়েছিল। সে হয়তো বা দর্শককে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে চায়নি। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে উন্মেষ ক্রমে দেখা যাচ্ছিল সেই সময়ে, তার প্রবল প্রভাব এসে পড়ে নাটকের দর্শক মহলেও। তাই দর্শক যে পথে হাঁটছে, হাঁটতে চাইছে, সেই পথেই সঙ্গ দেওয়ার কাজ করতে চেয়েছে নাট্যজগত। আর তার পাশাপাশি নজর রেখেছে তার মুনাফার অঙ্কেও। এইবারের রাজনৈতিক নাটক আর দর্শককে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার গুরুভার নেয়নি। বরং জাতীয়তাবাদীদের যে চরম প্রবণতাগুলোতে নাট্যদর্শক ইতিমধ্যেই উদ্বুদ্ধ হয়ে রয়েছে, সেই প্রবণতাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অথচ ঐতিহাসিক নাটকের রক্ষাকবচকে সঙ্গী করে দর্শকের পছন্দ মতো বিষয় ও আঙ্গিকে নাট্য প্রযোজনা উপহার দিয়েছিল এই সময়ের নাট্যগোষ্ঠীগুলি। ফলাফলস্বরূপ, ইংরেজ সরকার তেমন ক্ষুব্ধও হয়নি, আবার জাতীয়তাবাদী উদ্যমে হাজিরা দেওয়াও অনায়াস হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটি এইভাবেই পরিবেশিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

সবশেষ প্রশ্ন-বিভাগটি হল, নাট্য ইতিহাসে নাটকের মঞ্চস্থাপত্য ও দৃশ্যসজ্জার ইতিহাস সংক্রান্ত। প্রশ্ন এই, নাটকের ইতিহাসের মূল ধারাবিবরণীতে মঞ্চসজ্জার ইতিহাস স্থান পায় না কেন? শুধু কি তথ্য প্রমাণের অভাব? নাকি অন্য কোনো জটিল কারণের ফলাফল এটা? উনিশ ও বিশ শতকের নাট্য প্রযোজনাগুলির মঞ্চসজ্জার দৃষ্টি থেকে বাংলা নাট্য ইতিহাস লেখার প্রচেষ্টা করা হল না কেন, সে প্রশ্নটাও জরুরি। গবেষণারশেষ অধ্যায়ে তাই এই উনিশ-বিশ শতকের নাট্যমঞ্চভাবনা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলা নাট্যশালার মঞ্চসজ্জার প্রকৃতিকে জানতে কলকাতা শহরের ব্রিটিশ অধিবাসীদের পরিচালিত নাট্যশালায় মঞ্চপরিকল্পনার দিকে আমি নজর করার চেষ্টা করেছি। উইলিয়াম প্রিন্সেপের পরিচালিত নাট্যপ্রযোজনার মঞ্চসজ্জায় ব্রিটিশ অঙ্কনশৈলীর ‘পারস্পেকটিভ’ ড্রয়িং-এর বিশেষ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। মনুষ্য অভিনেতার শরীরের পাশে বাঙালি লোকশিল্পীর বানানো বিভিন্ন মাপের শোলার পুতুলকে দাঁড় করিয়ে পারস্পেকটিভ-এর ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করার পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ।

পাশাপাশি গেরাসিম লেবেদফের নাটকের মঞ্চশালাটি বেঙ্গলি স্টাইলে সজ্জিত হয়েছিল বলে জানা যায়। নবীন বসু নামের এক বাঙালির এক অভিনব নাট্য উদ্যোগের কথাওএইসূত্রেউল্লেখকরাহয়েছে। নবীন বসু আক্ষরিক অর্থেই এক সংকরায়িত বা হাইব্রিড নাট্য পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি নাটকের একেক দৃশ্য জমিদার বাড়ির একেক স্থানে অভিনয় করার ব্যবস্থা করলেন, কিছু দৃশ্যপট বানালেন দেশীয় শিল্পীদের দিয়ে, নাটকের টেক্সট হিসেবে নিলেন ভারতীয় সংস্কৃত একটি নাটক,আবার বিদেশ থেকে আনলেন মঞ্চসজ্জাসামগ্রী।

উক্ত মঞ্চভাবনাগুলোতে ভারতীয় ও ইউরোপীয় অঙ্কনসংস্কৃতির মিশ্রণে এক স্বতন্ত্র হাইব্রিড বা সংকরায়িত অঙ্কনশৈলী দেখা গেছিল বলে আমার পর্যবেক্ষণ। এই নতুন ধারার সংকরায়িত অঙ্কনশৈলীটির বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে সেই সময়ের কলকাতার অঙ্কনকলার জগতের বিবর্তনগুলিকেও আমার গবেষণার পরিধির মধ্যে নিয়ে আসতে হয়েছে। এই কারণেই এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে আন্তঃবিষয় স্বভাবেবা interdisciplinary ধরনে রচনা করতে হয়েছে। এই অধ্যায়ে শুধুমাত্র থিয়েটার জগতের তথ্যবিন্যাসের আমার গবেষণা কেন্দ্রীভূত হয়নি। থিয়েটারের পাশাপাশি এক অন্যতম স্থান নিয়েছে ঔপনিবেশিক চিত্রকলার ঐতিহাসিক বিবরণীটি।

আঠেরো শতকের শেষভাগ থেকে কলকাতার শিল্পসমাজ ‘শিল্পী’ ও ‘কারিগর’—এই দুই বিভাগে ভাগ হয়ে যেতে শুরু করেছিল। উচ্চবিত্তের শিল্পে মনোনিবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন যে শিল্পীরা, তাঁরাই প্রকৃত ‘শিল্পী’ হয়ে উঠলেন। বাকি নিম্নবিত্ত শিল্পীসম্প্রদায়কে ধরা হল Artisan বা কারিগর হিসেবে। ইউরোপীয় ঘরানার পার্স্পেকটিভ রীতিটির প্রভাব পড়তে থাকল ভারতীয় শিল্পী মহলে। মুঘল দরবারের শিল্পীদের উত্তরসূরীরা ইংরেজ কোম্পানীর হয়ে আঁকা শিখতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ আমলের গোড়া থেকেই। কিন্তু শত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলার লোকশিল্পীরা বিশেষত কালিঘাটের

পটশিল্পীরা নিজেদের শিল্পকলায় ইউরোপীয় প্রভাবকে প্রায় ঢুকতেই দিল না। পার্স্পেকটিভ রীতির নামমাত্র প্রভাব পটশিল্পে পড়লেও বিষয় নির্বাচনে বা অঙ্কন শৈলী—কোনো ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় বাস্তববাদী অঙ্কনরীতিতে পটুয়ারা প্রভাবিত হতে চাননি।

অঙ্কনশিল্পের ইতিহাসের সামাজিক বিশ্লেষণ করলে যে শ্রেণিসংঘর্ষের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তারই প্রভাব এসে পড়ে বাংলা নাট্য মঞ্চের দৃশ্যসজ্জার ইতিহাসে। সাধারণ রঙ্গালয়ের সময় থেকে ধীরে ধীরে বাংলা নাট্য প্রযোজনাগুলি থেকে বাদ পড়তে থাকল দেশীয় শিল্পীরা। তাঁদের অঙ্কন শিল্প তেমন 'রুচিশীল' হয়ে উঠতে পারল না, তাঁদের পুরোনো উপকরণে আঁকা রঙ ও তুলি তেমন 'ভালো' ছবি এঁকে উঠতে পারল না। তাঁদের সাবেক কালের অঙ্কন রীতি, অঙ্কন উপকরণে মন ভরল না ইউরোপীয় পার্স্পেকটিভ ড্রয়িং-এর স্বাদ পাওয়া নাট্য কুশীলব ও দর্শকদের। ক্রমে নাট্যমঞ্চে জায়গা করে নিতে থাকল ইউরোপীয় মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহের বৈশিষ্ট্যগুলি। এমনকি পার্শি থিয়েটারের প্রবল ঝাঁ-চকচকে মঞ্চসজ্জারও চমক এসে লাগল বাংলা মঞ্চে। এই পরিস্থিতিতে নিঃশব্দে বাংলা মঞ্চ থেকে প্রস্থান নিতে হল নিম্নবর্গের শিল্পীকূলকে।

সহজেই বোঝা যাচ্ছে, বাংলা নাটকের মঞ্চদৃশ্যকে বিবেচনা করতে গেলে উনিশ-বিশ শতকীয় কলকাতার সমাজের শ্রেণীভেদ ও রাজনৈতিক শ্রেণীসংগ্রামের নিরিখে বিশ্লেষণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। কলকাতার নাট্যমঞ্চে শুরুর দিন থেকে দেশীয় শিল্পীদের উপস্থিতি ও ক্রমে সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় ঘরানার শিল্পীদের মঞ্চ দখলে ন্যারেটিভটি বাংলা নাটকের মূলধারার ইতিহাসে জায়গা করে উঠতে পারেনি। বাংলা নাট্য মঞ্চসজ্জা নিয়ে এই গবেষণাটি শুধুমাত্র নাট্য গবেষণার একটি অংশ হিসেবে নয়, মূল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসধারার একটি বিকল্প সন্ধান হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বহন করে। মঞ্চসজ্জার লেন্স দিয়ে উনিশ বিশ শতকীয় সমাজটিকে পর্যবেক্ষণ করলে ঐতিহাসিক সমাজটি সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একটি নতুন বিবৃতি পরিলক্ষিত হয়। এই নতুন ন্যারেটিভ শুধু নাট্য ইতিহাসের পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে না। মূল ধারার ইতিহাসকে একটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ ঘটায়।

সিদ্ধান্তঃ

বর্তমান গবেষণা কর্মটি সময়ক্রমের একটি নির্দিষ্ট অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ অবিকৃত রেখে ধারাবাহিকভাবে লিখিত গবেষণা নয়। আমার ধারণা, এই গবেষণাটিকে কোনো পরীক্ষার ফলাফল না ভেবে, এটিকে একটি পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। এই পদ্ধতিটিকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে নাট্য-ইতিহাসের যেকোনো পরিধি বা যেকোনো ক্ষেত্রকে পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। গতানুগতিক ইতিহাসকে প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে নতুন তথ্যসামগ্রীর সন্ধান করাটা ইতিহাস গবেষণা করার একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। অথবা, মূল ধারার ইতিহাসের যে আখ্যানটি বহুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে, তার বিশ্লেষণ করে একটি ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে যে পুরনো ব্যাখ্যাগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে, তার নবতর বিশ্লেষণ করাটাও একটি বহুল প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি। কিন্তু ইতিহাসের সত্য প্রতিষ্ঠার যে মূল অবলম্বন আর্কাইভ, সেই আর্কাইভে প্রতিষ্ঠিত তথ্যসামগ্রীর মধ্যেকার ফাঁক বা নৈঃশব্দ্যকে নির্দেশ করার চেষ্টা হয়েছে এই কাজে। যা আর্কাইভে আছে

বা যা ইতিহাস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আছে, তা কেন আছে? আর যা নেই, অথচ থাকতে পারত, তা কেন নেই এই বিতর্কটিকে মাথায় রেখেই গবেষণাটি করা হয়েছে।

তাই এই পদ্ধতিতে বাংলা নাট্য ইতিহাসের সমস্ত পর্বগুলিকেই বারবার খুঁটিয়ে দেখা গেলে আমার বিশ্বাস, ইতিহাস আর কেবল নির্দিষ্ট ক্ষমতা-নির্ধারিত এক এবং একমাত্র ন্যারেটিভে বাঁধা থাকবে না। ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে বিভিন্ন আখ্যান নির্ভর; অসংখ্য তার দৃষ্টিকোণ, বিচিত্র তার গতিপথ; সত্য হিসেবে স্থান পেতেপারে বিভিন্ন বিচার-বিশ্লেষণ। শুধু ক্ষমতার স্বর নয়। ইতিহাসের মূল ধারার আখ্যান হিসেবে জায়গা করে নেওয়ার সুযোগ পাবে বিজিতের স্বরও। যদিও এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের মূল ভিত্তিটিকে সমূলে অস্বীকার করতে চাইছে না এই গবেষণা। কেবল প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের কিছু কিছু যৌক্তিক খামতিকে নির্দেশ করতে চেয়েছে। মূল ভিত্তির সঙ্গে সম্পূর্ণত অসম্মতি দর্শানোর জন্য এই গবেষণা নয়, বরং প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর একটি গঠনমূলক রাজনৈতিক সমালোচনা আহ্বানের উদ্দেশ্যে এই গবেষণার পরিকল্পনা করা হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য।

---------- ----------

গবেষকের স্বাক্ষর তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর